পিস-কিপার'স প্রোফাইল

কাজী জহিরুল ইসলাম

১৯ আগস্ট ট্রাজেডী ঃ বাগদাদের ক্যান্যাল হোটেল

মৃত্যুকূপ থেকে শান্তিলালের প্রত্যাবর্তন

'আমি তখন কম্পিউটারে বসে কিছু একটা টাইপ করছিলাম। হঠাৎ দেখি বিদ্যুচ্চমকের মতো আলো জ্বলে উঠলো। বিকট শব্দে কানে তালা লেগে গেল। পুরো বিল্ডিং থরথর করে কাঁপছে। এরপর আর কিছু মনে নেই।'

এরপর আর কিছু মনে থাকার কথাও নয়। কারণ শান্তিলাল ফার্নান্দো তখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। তার সমস্ত শরীর রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত। ১৯ আগস্ট ২০০৩ বাগদাদের ক্যান্যাল হোটেলে কি ঘটেছিল তা আমরা সবাই জানি। বিস্ফোরণের বিকট শব্দে ভেঙ্গে পড়ে ক্যান্যাল হোটেল, জাতিসংঘের ইরাক মিশনের সদর দফতর। মিশন প্রধান ব্রাজিলীয় নাগরিক সার্গিও ভিয়েইরা ডি মেলোসহ প্রাণ হারায় আরো ১৬ জন। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের ইতিহাসে এতোবড় দূর্ঘটনা আর ঘটে নি। সেদিন যারা এই ধ্বংসস্তুপের ভেতর থেকে বেঁচে ফিরে এসেছেন তাদের মধ্যে শ্রীলংকান নাগরিক শান্তিলাল ফার্নান্দো একজন। তিনি ১৯৯০ সালে কূটনীতিক স্ত্রীর সাথে পাড়ি জমান মার্কিন মুলুকে। ১৯৯৯ সালে যোগ দেন জাতিসংঘে। প্রায় সাড়ে তিন বছর কাজ করেন পূর্ব তিমুরে। এরপর ২০০৩-এর জুলাই মাসে যোগ দেন ইরাক মিশনে। এক ভীতিকর, থমথমে অবস্থার মধ্যেও ইরাকের দিনগুলো ভালোই কাটছিল। কারণ ওখানে সব স্টাফ একত্রে এক হোটেলে অবস্থান করতেন। কঠিন নিরাপত্তা বেস্টনীর মধ্য দিয়ে অফিসে আসা এবং হোটেলে ফেরা। খাওয়া-দাওয়াও ওই হোটেলেই, সবাই একসাথে। কিন্তু মাস দেড়েক না যেতেই সেই ভয়ঙ্কর ১৯ আগস্ট এসে গেল। আসুন সেই ভয়ঙ্কর দিনটির কথা শান্তিলালের কাছ থেকেই শুনি।

'অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও সকাল সাড়ে আটটায় অফিসে পৌঁছে যাই। আমি যদিও কাজ করতাম ডি মেলোর অ্যাডমিন সহকারী হিশেবে কিন্তু আমার অফিসটা ছিল তার অফিসের কয়েকটা রুম পরে। আমি রুম শেয়ার করতাম মিশনের বাজেট অফিসারের সাথে। দুপুরে আমরা কয়েকজন মিলে রেস্টুরেন্ট-এ যাই। একত্রে লাঞ্চ করি। মিশনের চিফ অব স্টাফ নারিয়ার সাথে আমার একটা দরকার

ছিল। লাঞ্চ থেকে ফিরে এসে নারিয়ার অফিসে যাই। তখন আড়াইটা বাজে। গিয়ে দেখি তিনি নেই। মিশন প্রধানের সাথে একটি মিটিংয়ে আছেন। আমি অপেক্ষা করতে থাকি। ওর আইরিশ সহকারী আমাকে বলে, আপনি বরং চলে যান, উনি ফিরে এলে আমি আপনাকে ফোন করবো। আমি নিজের রুমে ফিরে আসি। সেদিন কেমন যেন একটু অস্থিরতায় ভুগছিলাম। কিছুই ভালো লাগছিলো না। আমি আইরিশ মেয়েটিকে নিজেই ফোন করি। ও জানায় নারিয়া তখনো ফেরেন নি। কাজে মন দেওয়ার চেষ্টা করি। কিছু একটা টাইপ করছিলাম বোধ হয়। ঠিক মনে পড়ছে না। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ দেখি কাচের জানালায় আগুনের স্ফুলিঙ্গ। পুরো বিল্ডিং কাঁপছে। বিল্ডিংটা কি ভেঙ্গে পড়ছে? বিকট শব্দে কানে তালা লেগে গেল। এরপর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

যখন জ্ঞান ফিরে আসে তখন আমি একটি স্থানীয় ক্লিনিকে। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ক্লিনিকের কি নাম, কেন আমি এখানে, কিছুই জানি না। আমার সমস্ত শরীরে ব্যথা। দেখি আমি হাত নাড়াতে পারছি না, পা নাড়াতে পারছি না। আমার সারা গায়ে রক্ত। বুঝতে পারি কিছু একটা ঘটেছে। ওরা জানায়, ক্যান্যাল হোটেল আর নেই। আমি আতঙ্কে কেঁপে উঠি। আমি কি তাহলে বেঁচে আছি? আর অন্যরা? আমার সহকর্মীরা? কে আমাকে এখানে নিয়ে এলো? পরে জানতে পারি, ইউএস আর্মি আমাকে ধ্বংসস্তুপের ভেতর থেকে উদ্ধার করে এই ক্লিনিকে রেখে গেছে। স্থানীয় ডাক্তার জানায় আমার শরীরে অনেকগুলো সার্জারী করতে হবে। কিন্তু ওদের কাছে সার্জারীর পুরো সরঞ্জাম নেই। আমার নাকের মাংসে, মাথার পেছন দিকে, হাতে, পিঠে এবং পায়ে অসংখ্য কাচের টুকরো ঢুকেছে। আমার হাত থেকে তখনো রক্ত পড়ছে। ওরা কিছুতেই রক্ত বন্ধ করতে পারছে না। তক্ষুণি ওরা আমার হাতে সার্জারী করে অপ্রতুল সরঞ্জাম দিয়ে। আমি ডাক্তারদের জিজ্ঞেস করি, কেউ কি মারা গেছে? ওরা কিছুই বলে না। শুধু বলে, বম্ব ব্লাস্ট হয়েছে। ক্লিনিকের লোকেরাই আমাকে সাদ্দাম হোসেন হাসপাতালে নিয়ে যায়। এটি বাগদাদের একটি বড় হাসপাতাল। রাতে ওরা আমার নাকে অপারেশন করে। এবং জানায় হাতের অপারেশনটা ঠিক হয়নি, এটি আবার করতে হবে। ওরা আমার হাতের অপারেশন আবার করে। এরপর সিটি স্ক্যান করে। পরে মাথায় অপারেশন হয়। পরদিন সকালে একজন ডাক্তার জানায় আরো বেশ কয়েকটি সার্জারী করতে হবে।

আজ তিনদিন। বাড়ির সাথে কোন যোগাযোগ নেই। স্ত্রী সন্তানের সাথে যোগাযোগ নেই। ওরা নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছে আমি আর বেঁচে নেই। এই তিনদিনে আমি জাতিসংঘের কাউকে দেখি নি। সব অপরিচিত মানুষ। নিজের কষ্ট কারো সঙ্গে শেয়ার করতে পারছি না। আমি ভাবতেই পারছি না, ইউ এন থেকে কেন কেউ আমাকে দেখতে আসছে না? তাহলে কি সবাই মরে গেছে? কিছুক্ষণ পর চারজন ইরাকী ডাক্তারের একটি টিম আসে। ওরা অনকেগুলো টেস্ট করতে দেয়। তারপর আমাকে ফের অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যায়। বেশ কয়েক ঘন্টা অপারেশন হয়। এরপর আমাকে ওয়ার্ডে নিয়ে আসে। এটি খুব বড় হাসপাতাল। কিন্তু যুদ্ধের কারণে কোন কিছুই ঠিক নেই। কোন নার্স নেই, খাবার নেই। রুগীদের আত্মীয়-স্বজনরাই রুগীদের সেবা-যত্ন করে, খাবার-দাবার নিয়ে আসে। আমারতো কোন আত্মীয় নেই। পকেটে টাকাও নেই। আমার অসহায়ত্ব দেখে ইরাকী রুগীদের আত্মীয়রা সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেয়। অন্য রুগীদের খাবার থেকে আমাকে খেতে দেয়। এক বৃদ্ধা নারী আমাকে সময় করে অষুধ খাওয়ায়, শরীর থেকে রক্ত মুছে দেয়। আমার সমস্ত জামা-কাপড়তো রক্তে ভেজা। আমার গায়ে হাসপাতালের দেওয়া রুগীর পোশাক। এই পোশাকও ওদের পর্যাপ্ত নেই। আমি পোশাক বদলাতে পারছি না। শরীর থেকে বিশ্রী গন্ধ আসছে। হয়ত কোথাও মাংস পচে গেছে। পরে যখন নিম্নাঙ্গের অন্তর্বাস খুলি, তখন দেখি জমাট বিষ্ঠা শুকিয়ে আছে। চতুর্থ দিন মার্কিন টিভি চ্যানেল সিবিএস আসে। ওরা আমার সাক্ষাতকার নেয়। দলনেতা এক মার্কিন নারী। তিনি জিজ্ঞেস করেন, বাড়ির সাথে যোগাযোগ

হয়েছে? আমি বলি, হয় নি। তখন তিনি তার স্যাটেলাইট টেলিফোন দিয়ে আমার স্ত্রীকে ফোন করেন। এই প্রথম আমার স্ত্রীর সাথে কথা বলি। আসলে কোন কথা বলি না। শুধু দুজন দু'প্রান্ত থেকে কাঁদতে থাকি। আমার স্ত্রী তখন জাতিসংঘকে জানায় যে আমি বেঁচে আছি। সাদ্দাম হোসেন হাসপাতালে আছি। সেদিন বিকেলে একজন ডাচ সাইকোলোজিস্ট আসেন। তিনি টেলিভিশনে দেখে এসেছেন। আমাকে কাউন্সিলিং সাপোর্ট দেয়। তিনি আমাকে কিছু নতুন কাপড় কিনে দেন। তিনিই জানান যে মিশন প্রধান ডি মেলো মারা গেছেন। তার সঙ্গে তখন মিটিংয়ে যারা ছিলেন সবাই মারা গেছেন। নারিয়াও তাদেরই একজন। নারিয়ার আইরিশ সহকারীটিও মারা গেছেন। আমার সাথে রুম শেয়ার করতো যে বাজেট অফিসার, তিনিও মারা গেছেন।

পরদিন জাতিসংঘের নিরাপত্তাকর্মী আসে। আমাকে ইভাকুয়েট করে আম্মান নিয়ে যায়। আম্মানে ইউএন কাউন্সিলর আসে। ওখানে ৬ দিন ছিলাম। আমার পেশাব-পায়খানা বন্ধ। ওরা বলে, তোমার পেশাবের রাস্তায় পাথর আটকে আছে। অপারেশন করতে হবে। আমি রাজী হই না। আমি বলি, যা করার নিউ ইয়র্কে গিয়ে করবো। আসলে আমি স্ত্রীর কাছে ফিরে যেতে চাইছিলাম। এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে আপনজনের সাহায্য দরকার। এই ছয়দিন আমি আমার পরিবারের সাথে কোন যোগাযোগ করতে পারি নি। ইউএনডিপি'র কাছে টেলিফোন চাইলে ওরা বলে, বাজেট নেই। ছয়দিন পর নিউ ইয়র্কে যাই। ওখানকার ডাক্তাররা সবগুলো অপারেশন পুনরায় করে। নাকের মাংসে তখনো কাচের টুকরো ছিল। পেশাবের রাস্তা থেকে পাথর বের করে। এভাবে ধীরে ধীরে আমি সুস্থ জীবনে ফিরে আসি। এখনো চিকিৎসা চলছে। আগামী ডিসেম্বরে নাকে আরো একটি অপারেশন হবে।'

শান্তিলালের জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ দিনগুলোর কথা শুনতে শুনতে যখন আমি বারবার বিস্ময়ে আঁতকে উঠছিলাম তখন ও শিশুর মতো নির্মল হাসি দিয়ে বলে, 'দেখুন, আমি কিন্তু এতে হতাশ নই। ইউএন-এর প্রতি আমার কোন অভিযোগও নেই। এসব ঝুকি আছে জেনেইতো ইউএন-এ কাজ করতে এসেছি। আমি আনন্দিত এই ভেবে যে আমি মানুষের জন্য কিছু কাজ করতে পারছি। জন্মেছি যখন একদিনতো মরতে হবেই।' পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি কর্মীদের নৈতিক মূল্যবোধ ও বিনোদনের জন্য শান্তিলাল কাজ করেন। তিনি আইভরিকোস্ট মিশনের স্টাফ মোরাল এন্ড রিক্রিয়েশন কমিটির চেয়ারম্যান। পূর্ব তিমোরেও তিনি এই দায়িত্ব পালন করতেন। শান্তিলাল জানান, 'পূর্ব তিমোরে দেখতাম স্টাফরা বসে বসে শুধু মদ্যপান করে। আর কোন বিনোদনের ব্যবস্থা নেই। আমি প্রধান প্রশাসককে প্রস্তাব দিই, একটি রিক্রিয়েশন সেন্টার করার। ওখানে শরীরচর্চার ব্যবস্থা থাকবে, খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকবে, নাচ শেখার ব্যবস্থা থাকবে। সপ্তাহে একদিন হ্যাপি আওয়ার করবো আমরা। তিনি রাজী হন। আমি কাজে লেগে যাই। দারুণ কাজ হয় এতে। স্টাফরা অনেক চাঙ্গা হয়ে ওঠে। মদ খাওয়ার পরিবর্তে ওরা ব্যায়াম করতে শুরু করে। ব্যস্ত হয়ে পড়ে ভলিবল, টেবিল টেনিস, বাস্কেটবল নিয়ে।'

শান্তিলাল ক্ষোভ প্রকাশ করেন তার দেশ শ্রীলংকাসহ নানান দেশের সরকারের ওপর। 'আমরা দেশের জন্য মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছি, দেশে পাঠাচ্ছি। আমাদের বেতন থেকে জাতিসংঘ বিরাট অংকের টাকা প্রতি মাসে স্টাফ এসেসমেন্ট হিশেবে কেটে নেয়। এই টাকা কোথায় যায়? সদস্য দেশসমুহকে একটি বাৎসরিক চাঁদা দিতে হয় জাতিসংঘকে। সেই চাঁদার টাকা এখান থেকে নেওয়া হয়। সুতরাং আমরা আমাদের দেশের চাঁদার টাকার সিংহভাগ পরিশোধ করছি। অথচ আমরা আমাদের সরকারের কাছ থেকে এজন্য কোন এপ্রিসিয়েশন পাই না। বরং কোন কোন দেশের আয়কর কর্মকর্তা তাদের অজ্ঞতার কারণে আমাদেরকে হয়রানী করে।'

শান্তিলাল পুনরায় তার ইরাক ট্রাজেডিতে ফিরে গিয়ে বলেন, ‘আমরা যারা জাতিসংঘে কাজ করি তাদের সংগঠনের আদর্শের প্রতি কমিটমেন্ট থাকা দরকার। শুধু টাকার জন্য কাজ করলে মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানিতে যাওয়া উচিত। জাতিসংঘে তাদেরই আসা উচিত যারা বিশ্বের সকল মানুষের কাছে শান্তি, গণতন্ত্র ও উন্নয়ন পৌছে দিতে বদ্ধপরিকর।’

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
২৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৭

লেখক: কবি, জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক কর্মকর্তা